বাতাসে ফুল ঝরে যায়

[ন ভে লা]

বাতাসে ফুল ঝরে যায়

উম্মে ফারহানা

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস
নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99579-7-3

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

বা তা সে ফু ল ঝ রে যা য়
উম্মে ফারহানা

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ উপলক্ষে মুদ্রিত
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ২৫০ টাকা

Batashe Ful Jhore Jay
by Umme Farhana

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer

Printed and bound in Bangladesh

উ ৎ স র্গ

সায়মা সিদ্দিকা শিখা
ফয়সাল রহমান কিশোর
রোকসানা রহমান সিমি
রাসেল ও'নীল
পৃথ্বীরাজ বৈদ্য
রাজীব আশরাফ
আরিফুল ইসলাম
শৌভিক করিম অর্জুন
সাব্বির আহমেদ পল্লব
এবং
কাজী রুবায়েত ইসলাম তন্ময়

আমার ঝরে যাওয়া ফুলদের

এক

অমিত তখন মাত্র ড্রাইভারকে বিদায় করে দিয়ে অফিস থেকে বের হবার জন্য জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। ওয়্যারস গুছিয়ে রাখার জন্য একটা পাউচ আছে তার। তাতে ফোনের আর ইবুক রিডারের চার্জার, ইয়ারবাডস ভরে ল্যাপটপের মনিটর নামিয়ে ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ডগুলো নামিয়ে শেষবারের মতন চেক করেছে সবগুলো সুইচ ঠিকঠাক বন্ধ করা হয়েছে কি না। অফিস সহকারীর নাম শফিক, তাকে কয়েক বার বলার পরেও এই কাজগুলো সে প্রায়ই ভুল করে। একবার সে তার ল্যাপটপ চার্জে দিয়ে অফিস থেকে বের হয়েছিল। শফিককে বলা হয়েছিল আধঘণ্টা পরে চার্জারের সুইচ অফ করে দিতে। ঘণ্টাচারেক পর ফিরে দেখেছে ল্যাপটপ সে যেভাবে রেখে গিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই আছে, চার্জার খোলা হয়নি, সকেটের পাশের সুইচ অফ করাও হয়নি। সেদিন অমিত ভেবেছিল তাকে কিছুটা বকা দেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো বকাবকি না করে শান্ত গলায় বুঝিয়ে বলেছে কেন তার আধঘণ্টা পর চার্জার আনপ্লাগ করা উচিত ছিল। বকাবকিটা তার ধাতে নেই। কাউকেই কখনো উঁচু গলায় কিছু বলেনি সে। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত কেয়া। একটা বিশ্রী ঝগড়া কেয়ার সঙ্গে একবার তার হয়েছিল, সে এত জোরে চিৎকার করেছিল যে নিজের কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেছে, আক্ষরিক অর্থেই চুপ করে গিয়েছিল সে, এটা কি আসলেই সে? সাখাওয়াত আহমেদ অমিত?

বাথরুম থেকে বের হয়ে, সবগুলো সুইচ অফ করে অফিসের চাবি আর শফিকের রেখে যাওয়া গাড়ির চাবিটা টেবিল থেকে তুলে নিতেই ফোন বাজে। ফোন করেছে শিমুল। এই শ্যালকটির

সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ মধুর ছিল, কেয়া শেষবার বাসা ছেড়ে বাপের বাড়ি গিয়ে সাতদিন থেকে আসার পর থেকে, সে লক্ষ করেছে, শিমুল তার সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় বলেই না। রীতিমতো এড়িয়ে চলা শুরু করেছে। এমনকি শেষ ঈদে তার সঙ্গে কোলাকুলি পর্যন্ত করেনি। তার উদ্যত আলিঙ্গন থেকে নিজেকে প্রায় ছুটিয়ে নিয়ে দ্রুত বাসা থেকে বের হয়ে যেতে থাকা শিমুলের প্রস্থানের দিকে তাকিয়ে অমিত বজ্রাহতের মতন দাঁড়িয়ে ছিল একতলা আর দোতলার মাঝের সিঁড়িঘরের অপ্রশস্ত ল্যান্ডিংয়ে। কেয়া ততক্ষণে দোতলায় উঠে গেছে। সে শুধু ভেবেছে ঘটনাটা বাসার অন্যদের সঙ্গেও একই রকম ঘটবে কি না। শাশুড়িও পা সরিয়ে নেবেন কদমবুসি করতে গেলে? পলাশ তাহলে কী করবে?

'হ্যালো...দাদাবাবু'

বহুদিন পর শিমুলের মুখে দাদাবাবু শুনে অমিতের একটা ধাক্কার মতন লাগে। তার গাট ফিলিংস বলতে থাকে 'সামথিং ইজ ভেরি রং।' শিমুলের গলা প্রায় কাঁপছে। কেয়ার সঙ্গে বিয়ের সময় তার বড় শ্যালক পলাশ এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে আর শিমুল মাত্র ক্লাস এইটে। কেয়ার খুব শখ ছিল তার ভাইয়েরা তার বরকে দাদাবাবু বলে ডাকবে। পলাশ ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, 'এহ, দুলাভাইকে দাদাবাবু বলব কেন? ভাইয়া বলতে পারি।' কেয়াদের বাসায় বড়দের নাম মুখে আনা বেয়াদবি হিসেবে ধরা হয়। অমুক ভাই তমুক আপু শুধু বাইরের মানুষদের বলে ওরা। মামা-চাচা খালু-ফুপা কারো নাম কেউ মুখে নিতে পারে না। সে শুরুতে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। একদিন কী প্রসঙ্গে সে বলেছে, নাজমা খালা, সঙ্গে সঙ্গে তার শাশুড়ি বলেছেন, 'তোমার মেজখালা', সে প্রথমে বোঝেনি ভুলটা কী হলো। কিন্তু জিজ্ঞেসও করেনি, তারপর কিছুদিন যাবার পর সে দেখেছে ওরা নিজের চাচাদের বড়, মেজ, সেজ বলে উল্লেখ করে আর জ্ঞাতি চাচাদের বলে 'নাবিলের আব্বু' চাচা কিংবা 'ফাইজার আব্বু' চাচা, কখনো

'খলিল চাচা' কিংবা 'ফারুক চাচা' নয়। অমিতের কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হয়েছিল, কিন্তু সে কোনো মন্তব্য করেনি। একেক পরিবারের কালচার একেক রকম হবে সেটাই স্বাভাবিক।

'কী অবস্থা শিমুল? সব ভালো?'

ইচ্ছা করেই কেমন আছিস না বলে ভাববাচ্যে প্রশ্নটা করে। শিমুলের আচরণের শীতলতার সঙ্গে তুই সম্বোধনটা এখন আর যায় না। কেয়াদের বাসায় কেউ কাউকে তুই বলে ডাকে না এমনিতেও। ওদের কাছে তুই শব্দটা তুচ্ছার্থে বলা ডাক। কিন্তু সে শুরু থেকেই দুই শ্যালককে তুই বলে সম্বোধন করে এসেছে। তুই যে ওদের পরিবারে গ্রহণযোগ্য নয় তা জানা ছিল না, থাকলে হয়তো বলত না। বছরখানেক পরে সম্বোধন পাল্টানো যাবে না এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু ওদের সঙ্গে আন্তরিকতা হয়ে গিয়েছিল, ওরাও সম্ভবত এই নিয়ে বিব্রত ছিল না। সে কতকাল আগের কথা...অনিন্দিতার জন্মের আগে সম্ভবত। সে আর পলাশ, কেয়া আর শিমুল দুই দলে ভাগ হয়ে লুডু খেলত, ফুচকা খেতে যেত, সারারাত ক্রিকেট খেলা দেখত, সিনেমা দেখত। কেয়ার পরিবারকে নিজের করে নিয়েছিল সে। সুখের দিন ছিল সেসব...

'না, দাদাবাবু। খবর ভালো না'

অমিত শ্বশুর কিংবা শাশুড়ির অসুস্থতা সংক্রান্ত কিছু শোনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। দুজনেরই বয়স অসুস্থ হবার মতন। কেয়ার মা কিছুদিন পর-পরই অসুস্থ হন, তাঁকে হাসপাতালে নিতে হয়। শেষ কয়েকবার তিনি ছিলেন এপোলো আর স্কয়ার হাসপাতালে। চেকআপের পর কিছু ওষুধবিশুধ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় তাঁকে প্রতিবারই। অমিতের কিঞ্চিত সন্দেহ হয়েছে, সম্ভবত তার শাশুড়ি মায়ের জন্য কিছুদিন পরপর দামি কোনো হাসপাতালে দিনদুয়েক কাটিয়ে আসা একটা শখের ব্যাপার। পরবর্তী ছয় মাস তিনি তাঁর আশপাশে বসবাস করা জা এবং ননদদের সঙ্গে জাঁক করে বলতে পারবেন এক রাতে হাসপাতালের বিল কত হয়েছে, তাঁর ডাক্তারপুত্রের কল্যাণে কত খাতির আর ছাড় পেয়েছেন ইত্যাদি। অমিত এহেন ভাবনা

আসাতে নিজের কাছেই লজ্জা পেয়েছে আবার। প্রৌঢ়া একজন গৃহিণী, যার জীবনে রান্না খাওয়া আর সিরিয়াল দেখা ছাড়া তেমন কিছুই নেই, আত্মীয়স্বজনের কাছে নিজের সন্তান নিয়ে গর্ব করতেই পারেন। এটা নিয়ে জাজ করা উচিত নয় কাউকে। মাতৃস্থানীয়া কারো সম্পর্কে অসম্মানজনক কিছুকে সে মনেও স্থান দিতে চায় না। খুব সচেতনভাবে সে এইসব চিন্তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। শুধু গুরুজনদের ক্ষেত্রেই নয়, যে কারো জন্যই তার একই প্র্যাকটিস। কারো সম্পর্কে কু-কথা মনে এলে নিজেকে সে মনে করিয়ে দেয়, আই'ম নোবডি টু জাজ এনিবডি।

'আম্মার শরীর কেমন? নাকি আব্বা?'

সেই ঈদের দিন শাশুড়ি পা সরিয়ে না নিলেও আগের মতন হাত ধরে ফেলা বা প্রায় জড়িয়ে ধরার ভঙ্গি করেননি। আলগোছে একটু মাথায় হাত রেখেছিলেন, দায়সারা একটা 'ফি আমানিল্লাহ' বলে পাশে রাখা খাম থেকে একটা এক হাজার টাকার নোট ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়িতে কদমবুসির কালচার তেমন নেই। সালামি দেওয়াও অত গুরুত্ব পায় না। নতুন বউ বা জামাইদের দেন মুরব্বিরা। কিন্তু কেয়াদের বাসার রেওয়াজ আলাদা। অমিত সেটা কষ্ট করে আয়ত্ত করেছিল। কেয়ার সকল চাচা-চাচি মামা-মামি খালা-খালু ফুপা-ফুপিদের কদমবুসি করেছে প্রতি ঈদে। তবে সেদিন শাশুড়ির পা ছুঁয়ে সালাম করার পর তাঁর দায়সারা অভিব্যক্তি দেখে সে ঠিক করেছিল আর কখনো কাজটা করবে না, আর করেওনি। শত হোক, এটা তার ব্যক্তিগত রিচুয়াল নয়, তাদের বাড়ির প্রথাকে সম্মান করার জন্যই অভ্যাস করেছিল সে। এখন যদি তারাই সেটা গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে তার কোনো দায় নেই।

'আম্মা আব্বা ভালো আছে, বউমণি ভালো নাই'

অমিত একটি হৃৎস্পন্দনের অভাব টের পায় নিজের বুকের ভেতর।

দুই

সুমাইয়া গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। ঢাকার মানুষেরা এত গাছ পছন্দ করে দেখে সে খুব বিস্মিত হয়েছিল, প্রথম যখন ঢাকায় এসেছিল তখনই। প্রায় সব আবাসিক ভবনের সংকীর্ণ বারান্দায় ফুলের গাছ, ছাদে বেগুন পটল পর্যন্ত চাষ করে ফেলছে লোকে। সে সব সময়ই অবাক হয়ে ভেবেছে, তাহলে বাড়ি বানাবার সময় এরা খানিকটা জায়গা ছেড়ে বানায় না কেন? তাহলে তো গাছপালা কিছু রাখা যেত। বাক্সের মতন খোপ খোপ ঘরবাড়ি, আর বারান্দায় শহুরে মিনিয়েচার বাগান। একটা জানলা থেকে বের হয়ে আছে হলুদ বাগানবিলাসের কয়েকটি ডাল, যেন হাত বাড়িয়ে আছে, বের হতে চাইছে বারান্দার বন্দি জীবন থেকে।

সুমাইয়া এখনো ঢাকা শহরের বন্দি জীবনে অভ্যস্ত হতে পারেনি। সারাদিন দু'হাজার স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের দুই-তিনটা ঘরে টুকটাক কাজকর্ম করে আর টিভি দেখে তার হাঁপ ধরে যায়। ঘুরে ফিরে তার শুধু মনে পড়ে আম্মার বাসার উঠান আর টানা বারান্দার কথা, তাদের টিনের চালে লতিয়ে ওঠা পুঁইশাক আর চালকুমড়া গাছগুলোর কথা। মানুষ কীভাবে একটা বাক্সের ভেতর দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয় তা সে বুঝতে পারে না। তার মন পড়ে থাকে জয়নুল পার্কে, কাচারি ঘাটে, আনন্দমোহনের মাঠে। কিন্তু সব ছেড়ে ঢাকায় চলে আসা ছাড়া তার তো কোনো উপায়ও ছিল না আর। ঢাকার বাতাস এখনো তার কাছে ভারী লাগে। কেমন যেন ধাতব একটা অনুভূতি হয়। এটা নাকি সিসার জন্য হয়। শোয়েব বলত, পেট্রলের এন্টিনক হচ্ছে টেটরা ইথাইল লেড, যেখানেই পেট্রলে কিছু চলবে সেখানেই বাতাসে সিসা থাকবে।

ফারাবি খুব বিরক্তমুখে কোলে ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে। আজকাল ফোনেই মেইল-টেইল সব চেক করা যায়, অফিসের কাজের দোহাই দিয়ে মুখের সামনে ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকার মানে নেই কোনো। সুমাইয়ার ধারণা, ফারাবি এই কাজটা করে

নিজেকে খুব ব্যস্ত দেখিয়ে লোকজনকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। তাই বলে একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে হাসপাতালে যাবার সময়েও অফিসের কাজ করতে হবে? সে সামান্য বিষণ্ন বোধ করে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, এই ব্যাপারটাতে তাকে অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে আগে কিংবা পরে। বাক্সে জীবন যাপন করার মতন। খানিক লজ্জিতও হয়, রিমঝিম আপুর অবস্থা নাকি ভালো না, এই সময়ে সে নিজের দাম্পত্য সম্পর্কের ঘাটতি নিয়ে ভাবছে। ফারাবির সঙ্গে বিবাহিত জীবন শুরু করার পর থেকে সে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছে। শোয়েবকে ভুলতে না পারার জন্য নিজেকেই দোষ দেয় সে। শোয়েবের স্মৃতি কি ফারাবিকে গ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছে নাকি উল্টোটা? ফারাবির উদাসীনতাই শোয়েবকে ভুলতে দেয় না?

সে ঠিক করে এই মুহূর্তে এসব নিয়ে আর ভাববে না। সে রিমঝিম আপুর কথা ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কী এমন অসুস্থতা হতে পারে রিমঝিম আপুর? সুমাইয়া ভেবে পায় না, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক—এগুলো তো বুড়া মানুষের হয়, রিমঝিম আপু কি অত বয়স্ক? সে অনুমান করার চেষ্টা করে রিমঝিম আপুর বয়স কত হতে পারে...অনেক ছোটবেলা আপুর বিয়ে উপলক্ষে ঢাকা এসেছিল, সে তখন ক্লাস টুতে পড়ে। সে সময়ের স্মৃতি তার ঝাপসাভাবে মনে পড়ে। গাড়িতে উঠলেই তার গন্ধে বমি আসত। পেট্রল কিংবা ডিজেল, সে জানে না জিনিসটা ঠিক কী? একটা মাইক্রোবাসে করে রিমঝিম আপুর বরের গায়ে হলুদে যাচ্ছিল সবাই, অনেক কষ্টে বমি সামলে, হাতে এক টুকরো লেবু নিয়ে সে বসে ছিল। দাদি তখন বেঁচে, নিজের বটুয়া থেকে একটুখানি সুপারি বের করে বললেন, 'এইডা মুহো দে।' সেটা কত বছর আগের কথা? বিশ-বাইশ বছর? নাকি আরো বেশি? তখন যদি আপুর বয়স একুশ বা বাইশ হয়ে থাকে, এখন তার বয়স চুয়াল্লিশ। পঁয়তাল্লিশও যদি হয়, এটা কি স্ট্রোক করার বয়স? কে জানে?

নানাকিছু ভাবতে ভাবতে সুমাইয়া দেখে আবাসিক এলাকা থেকে বের হয়ে গেছে গাড়ি, বাইরে এখন শুধুই দালানকোঠা, আবাসিক দালানের ব্যালকনিগুলোতে অন্তত টবে গাছ থাকে, বাণিজ্যিক ভবনগুলো একেবারেই বাক্স। গুলশান বনানী বাদে বাকি ঢাকা শহরের কোথাও কেন দৃষ্টিনন্দন বাড়িঘর নেই এই ভেবে সে খুব বিরক্ত বোধ করেছে সবসময়ই। ফারাবি শুনে বলেছিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যা কিছু ভালো সবই তো তোমাদের ময়মনসিংহে।' সে তর্ক করেনি, ময়মনসিংহ একটা নোংরা ঘিঞ্জি ছোট মফস্বল শহর, ঢাকা তো রাজধানী, এই দুইয়ের তুলনাই চলে না। ঢাকার তুলনা হবে দিল্লির সঙ্গে, ইসলামাবাদ কিংবা কলম্বোর সঙ্গে। তার ময়মনসিংহ ছেড়ে আসার বেদনা লুকিয়ে ফেলতে শিখেছে সে গত দুই বছরে। ফারাবি খুব বিরক্ত হয় ময়মনসিংহ যেতে হলে, গাড়ি রাখার জায়গা পাওয়া যায় না, একে তাকে অনুরোধ করে গ্যারাজের ব্যবস্থা করতে হয়, তাদের বাসার চিপা গলিতে গাড়ি ঢোকে না—ইত্যাদি নানা বিরক্তির উপাদানে পরিপূর্ণ তার বাপের বাড়ির এলাকা; জামাই আদরের কমতি না থাকলেও শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মজা পায় না ফারাবি। সে একবার বলেছিল, চলো এবার আমরা ট্রেনে যাই। ফারাবি প্রস্তাবটাকে এক কথায় নাকচ করে দিয়েছে, 'আরে ধুর, বেড়াতে গিয়ে এত ঘড়ি ধরে চলা যায় না।'

'তাহলে বাসে?'

'তোমাদের ওই এনা বাস? শুয়োরের মতন চালায়।'

সুমাইয়ার নিজেরও বাস খুব অপছন্দ, এনার অসম্ভব বেপরোয়া গতির কথা ভাবলে তার ভয়ও করে, এই অপ্রিয় বাহনে যেতে হলেও যে সে ময়মনসিংহ যেতে চায়, এটা ফারাবি বোঝে না তবুও। অথবা হয়তো নিজের শহরের জন্য মন পোড়ার অনুভূতি বোঝাতে পারে না সে। হয়তো এটা তারই দোষ, তারই ঘাটতি। যেভাবে ঠিকঠাক গোল রুটি বানাতে পারে, যেভাবে কাপড় আয়রন করতে পারে, যেভাবে প্রতিটি সমান পুরুত্বের স্লাইসে পেঁয়াজ কাটতে পারে, সেভাবে সে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে কেন পারে না?

সাহেব কোয়ার্টারের বড় বড় গাছের ছায়া-ঢাকা রাস্তা, কেওয়াটখালির রেলব্রিজ, এগ্রিভার্সিটির নারিকেল বাগানের ছবি ফিরে ফিরে আসে তার মাথায়। সিসাভরা বাতাস নাকে আসছে না গাড়ির এসি চালু বলে। চোখের সামনে কুচ্ছিত শহরের ছবি মুছে দিতে চেয়ে চোখ বোজে সে। ছোট্ট চার্চের সাদা ক্রস, ঈদগাহ মাঠের পুকুরের পানি আর সার্কিট হাউজ মাঠের সবুজ ঘাসের ছবি কল্পনায় দেখে নেয়। সে ভেবে নেয় গাড়ি চলছে কাঠগোলার রাস্তা দিয়ে, চোখ খুললেই যেন দেখা যাবে দুপাশে গাছপালা, ছোট্ট বাজার আর চায়ের দোকান, স মিল আর চুপশা পীরের মাজার। যেন এই গাড়ি ঢাকার ব্যস্ত রাস্তায় নয়, চলছে ব্রহ্মপুত্রের পাশের এক সাদামাটা জনপদের মধ্যে দিয়ে।

ফোনের ভাইব্রেশনে তার চিন্তায় ছেদ পড়ে, মেজফুপু ফোন করেছেন।

'সুমু, তুই খবর হুনছস?'

'হ ফুপু, আমি যাইতাছি।'

হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন ফুপু, 'এইডা কী অইলো?' একটা কথাই বোঝা যায় শুধু—তাঁর আহাজারি থেকে আর কোনো কথার মর্মার্থ বের করা সম্ভব হয় না। অপাঙ্গে ফারাবির দিকে চেয়ে সে শান্ত স্বরে বলে, 'ফুপু দুয়া করুইন, বালা অইয়া যাইব, দুয়া করুইন।' তার কণ্ঠ কেঁপে ওঠে, তার মন বলে রিমঝিম আপু হয়তো আর ভালো হবে না। তারপর নিজেকেই এমন অশুভ চিন্তার জন্য ধিক্কার দেয়। অসুখ-বিসুখ মানুষের হতেই পারে। এতে বিচলিত হবার কিছু নেই। চিকিৎসা চলছে, নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে।

কিন্তু রিমঝিম আপুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুব বড় কিছু না হলে জানাত না কাউকে। তার গর্ভিণী হবার খবর বাপের বাড়ির লোকেরা পেয়েছে পাঁচ মাস হবার পর। বড় ফুপু বেজায় রেগে গিয়েছিলেন সে বার। সাধারণত শান্ত স্বভাবের মহিলা বড় ফুপু, সব সময় মুখে তাঁর হাসি। সামান্য জোকস শুনলেই উচ্চস্বরে হাসতে থাকতেন তিনি। সে বার কোন গতিকে যেন বড় ফুপুর

বাসায় ছিল সে, ফুপুর সঙ্গেই ঘুমাত। রাতে ঘুম ভেঙে শোনে বড় ফুপু ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছেন আর কার কাছে যেন অভিযোগ করছেন, 'তুই-ই ক, এইডা কুনো কথা? আমার ঝি পোয়াতি অইছে আর আমি জানি না?' ফোনের উল্টোদিক থেকে সম্ভবত মেজফুপু কিংবা ছোট ফুপু সান্ত্বনামূলক কিছু বলতে গিয়ে চরম ঝাড়ি খেলেন, 'থ ফালায়া অর হোউড়ি, আমারে কইলে কি আমি অর হোউড়িরে কইয়া দিতাম?'

মশারির ভেতরে শুয়ে নিজের মনেই হাসছিল সে তখন। রিমঝিম আপুর শাশুড়িকে বলে দেওয়ার ব্যাপারে বড় ফুপুকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। ওনার পেট পাতলা, কোনো কথা গোপন রাখতে বললে সেটা তিনি হজম করতে পারতেন না কখনো। বলতে যে মানা করা হয়েছে সেটাই ভুলে যেতেন বেমালুম। আহা রে বড় ফুপু। সোজা-সরল পেট পাতলা বড় ফুপু! বড় ফুপুর বাসা থেকে কেউ না খেয়ে বের হতে পারত না। ময়মনসিংহ থেকে যত আত্মীয় ঢাকায় আসতো, ভর্তি পরীক্ষা দিতে, চিকিৎসা করাতে, শপিং করতে, বিদেশে যেতে—সবাই এসে উঠত বড় ফুপুর বাসায়। ছোট ফুপুর ভাষ্যমতে, 'যত মড়া গাঙ দিয়া ভাসে, ব্যাহে আয়া বেহুলারে ঠাসে।' বলেই একটা মুখ ঝামটা দিতেন, 'আফা, আফনের কি কুন খায়াদায়া কাম নাই? হারাডা জীবন ত ম্যামানদারিই করলাইন, অ্যালা খ্যান্ত দেইন।' বড় ফুপু বলতেন, 'আমি কি অগরে কমু, তরা আইস না য্যা?' কাউকে না খাইয়ে বিদায় করা যার পক্ষে সম্ভব হয় না তিনি কী করে কাউকে তার বাসায় আসতে নিষেধ করবেন?

তো এই বড় ফুপুই রেগে আগুন তেলে বেগুন হয়ে গিয়েছিলেন রিমঝিম আপুর প্রেগন্যান্সির খবর দেরিতে পেয়ে। সুমাইয়ার যতদূর মনে পড়ে রিমঝিম আপুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন বেশ অতিথিপরায়ণ আর অমায়িক ছিলেন। মাঝখানে কী এমন ঘটল যে দুই বিয়াই-বাড়িতে দূরত্ব সৃষ্টি হলো—তা সে সঠিক জানে না। প্রেগন্যান্সির খবর না জানানোর পেছনে কোনো সংস্কার কাজ

করতে পারে। অনেকে নজর লাগার ভয়েও বলে না। কিন্তু সেটা ছাড়াও আগের মতন যাতায়াত আর দাওয়াতের আদান-প্রদান কমে গেছে। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া সবকিছু। কোনো বড় সমস্যা হতে পারে। সে দুধভাত হিসেবে অনেক গল্প থেকেই বাইরে থাকত। তাকে বলা হতো, 'সুমু, তুই একটু বাইরে যা তো।' সে কখনো অতটা বেয়াড়া হতেই পারেনি যে ঘাড় ত্যাড়া করে বলবে, 'ক্যান? বাইরে যাইতে হবে ক্যান?'

রিমঝিম আপুর অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয় বলেই মনে হচ্ছে। ডাক্তাররা এসব বুঝতে পারেন। যখন ডাক্তাররা আর আশার কথা শোনান না তখন আত্মীয়রা ভেঙে পড়েন, দূরের আত্মীয়দের খবর দেওয়া শুরু করেন। তার আচমকা মনে হয়, সে হঠাৎ মৃত্যুশয্যায় পড়লে ফারাবি যাদের খবর দেবে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই শোয়েব নেই। থাকবেই বা কেন? ফারাবি তো শোয়েবকে চেনেই না। তার মানে ব্যাপারটা এমন যে সে মারা গেলে শোয়েব খবর পাবে ছয় মাস এক বছর পরে? কিংবা শোয়েবের কিছু হলে সে জানতে পারবে না কিছুই?

তিন

গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুম পায় অমিতের। অথচ ড্রাইভারকে বিদায় দিয়েই কড়া এক কাপ কফি খেয়েছে সে। আজকে আম্মার ওখানে যেতেই হবে। বেশ কয়েকদিন ধরেই আম্মা বলছিলেন কী যেন স্বপ্নে দেখেছেন তাকে নিয়ে। আয়াতুল কুরসি পড়ে মাথায় একটু ফুঁ দিতে মন চাইছে। সে যেন একদিন গিয়ে ফুঁ নিয়ে আসে। ছোটবেলায় আম্মার এই আয়াতুল কুরসি পড়ে দেওয়া ফুঁ খুবই রিঅ্যাশিওরিং ছিল। পরীক্ষা শুরুর দিন পা ছুঁয়ে সালাম না করলেও আম্মা আব্বার কাছ থেকে দোয়া নিত সে। বের হওয়ার আগে আয়াতুল কুরসি পড়ে একটা ফুঁ দিয়ে দিতেন আম্মা।

পরীক্ষাকে তখন ডালভাত মনে হতো। এমএ ফাইনাল পরীক্ষার দিনেও সে এই ফুঁ নিয়েই পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। এমনিতে অত ধার্মিক না হলেও কিছু রিচুয়াল তার খুব ভালো লাগে। আম্মার এই দোয়া পড়া ফুঁ তেমনই একটা। কেমন যেন সাহস এসে যায় ভেতর থেকে। মনে হয় মায়ের সকল শুভকামনা যেন ঘিরে আছে তাকে।

আম্মাকে যদি ফোন করে বলে রিমঝিম খুব অসুস্থ, সে হাসপাতালে যেতে চায় তাহলে কি আম্মা মন খারাপ করবে? অথচ সে নিজেই তো শিমুলকে বলল যে আজ মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতেই হবে, হাসপাতালে সে পরে কখনো যাবে আর কোনো কিছু দরকার হলে যেন তাকে জানানো হয়। অন্তত দেশের বাইরে নিতে হলে দ্রুত ফ্লাইটের টিকেটের ব্যবস্থা তো সে করতেই পারবে।

সিজারহ্যানডের কাছে এসে সে গতি কমায়। রিমঝিমের একজন প্রিয় নায়ক জনি ডেপ। জনি ডেপের একটা ছবির নাম *এডওয়ার্ড সিজারহ্যান্ড*। রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম।

রিমঝিম খুব ডি'ক্যাপ্রিওরও ভক্ত। ওর খুব প্রিয় একটা ছবি হলো *হোয়াট'স ইটিং গিলবার্ট গ্রেইপ*। তার প্রিয় দুই সুপারস্টারই আছে সেই ছবিতে। ছবিটা দেখার পর উচ্ছ্বসিত হয়ে ও ফোন করেছিল অমিতের অফিসে। তখন ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র বছরখানেক। ওদের ধুমধাম করে করা প্রথম বিবাহবার্ষিকীর কিছুদিন পর, একদিন অফিস টাইমে ফোন করে বলল, 'অমিত ভাই, আপনি কী *হোয়াট'স ইটিং গিলবার্ট গ্রেইপ* দেখেছেন?'

অমিত বলে, 'দেখেছি, বইটাও পড়েছি।'

'ওহ্, এটার একটা বইও আছে?'

'আছে', অমিত ভদ্রতা করে বলে, 'তুমি পড়তে চাও?'

অমিত সাধারণত কাউকে বই ধারটার দেয় না। বই তার কাছে শুধু পড়ার বিষয় নয়, কালেক্ট করারও জিনিস। কিন্তু শালার বউয়ের সঙ্গে সামান্য আলগা খাতিরের আলাপ করাই যায়। ওতে

দোষ নেই কোনো, বরং এটা বৈবাহিক দায়িত্বের মতন।

রিমঝিম যে আসলেই পড়তে চাইবে তা সে ভাবেনি। সে বলে, 'আচ্ছা, নেক্সট যেদিন তোমাদের বাসায় যাব, সেদিন নিয়ে যাব, কেমন?'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি বোধ হয় ব্যস্ত, আজকে তাহলে রাখি, আসসালামু আলাইকুম।'

ফোন ধরার সময় সম্ভবত সে উত্তেজনায় সালাম দিতে ভুলে গিয়েছিল, তাদের দুজনের শ্বশুরবাড়ির যা রেওয়াজ।

পরের শুক্রবার কেয়াদের বাসায় যাওয়ার সময় সে বইটা সঙ্গে করে নিয়ে যায়। সেই থেকেই তাদের দুজনের মধ্যে স্বাভাবিক ভদ্রতার বই বিনিময় ধরনের, খানিকটা বন্ধুত্বের মতন যোগাযোগ শুরু।

বইটা এক সপ্তাহ বাদে ফেরত দেয় রিমঝিম। শিমুলের ঘরে তখন তারা সবাই আড্ডা দিত। রিমঝিম বই ফেরত দেওয়ার সময় হড়বড় করে একগাদা কথা বলে। তার এই প্রগলভতায় অমিত ভীষণ অবাক হয়। তার ধারণা, বাসার অন্যরাও খানিকটা অবাকই হয়। তখন সেই এক বছর চার মাস ধরে তাঁদের বাড়িতে এসে বসবাস করতে থাকা মেয়েটিকে এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলতে মনে হয় কেউ শোনেনি আগে।

পলাশ কি শুনেছে?

'সুদূর আমেরিকার আইওয়া প্রদেশের এন্ডোরা নামের ছোট্ট একটা শহর, প্রায় গ্রামের মতনই, যেখানে তেমন কিছু ঘটে না, আগেও ঘটেনি, আগামীতেও ঘটবে না...তেমন খুব তুচ্ছ একটা শহরের কম বয়সি একটা ছেলের গল্প; ছেলেটার মায়ের, ভাইয়ের, বোনের গল্প। ঠিক যেন আমেরিকার *শঙ্খনীল কারাগার* কিংবা *নন্দিত নরকে*। কিংবা আমেরিকার *পুতুলনাচের ইতিকথা*। গিলবার্টও শশী ডাক্তারের মতন আটকে পড়েছে, ছুটে বের হতে পারছে না। তাই না ভাইয়া?'

রিমঝিম ঠিক বৃষ্টির আওয়াজের মতনই ঝরঝর করে বলে যাচ্ছিল বেশ কয়েক বছর আগে বের হওয়া সদ্য পড়া বইটা

নিয়ে। তারপর শেষে বলল, 'বইটা ফিল্মটার চেয়ে সুন্দর।'

'কিন্তু বইয়ে তো তোমাদের আই ক্যান্ডিরা নেই।'

'কে? জনি ডেপ আর লিওনার্দো ডি'ক্যাপ্রিও?' বলেই খিলখিল করে হেসে দিল। রিমঝিমের নাম কি এ জন্যই রিমঝিম? ও হাসলে বৃষ্টির মতন আওয়াজ হয় বলে?

অমিতের খুব ভেতর থেকে একটা ঘূর্ণিঝড়ের মতন অনুভূতি বের হয়ে আসতে চায়। সে হঠাৎ করে অনুভব করে তার চিৎকার করে কাঁদতে মন চাইছে। ছেলেদের এই অনুভূতিটা কেউ কখনো বুঝতে চায় না। শুধুমাত্র পুরুষ হয়ে জন্মাবার দোষে যে সে যখন তখন ডুকরে, ফুঁপিয়ে কিংবা আর্তনাদ করে কাঁদতে পারছে না, তাকে যে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়েছে সে একটা ছেলে, সে কাঁদতে পারবে না, সে যে সারাটা জীবন এমন একটা আশ্রয় খুঁজেছে যার কাছে গিয়ে খুব করে কাঁদা যাবে, আর কখনোই পায়নি—এ যে কত বড় অভিশাপ পুরুষজন্মের!

এই কারণে অমিত সারাজীবন শাওয়ারে কেঁদেছে। আধঘণ্টা ধরে সে শাওয়ার কেন নেয় তা অনেকেরই বিস্ময়ের কারণ ছিল। খুব পরিচ্ছন্ন মানুষ বলেই শুধু তা নয়, অমিত জানে যে পাঁচ মিনিটেও খুব পরিচ্ছন্ন স্নান সম্ভব। কিন্তু সে সারাদিনের সব খারাপ লাগার অনুভূতিগুলোকে ময়লার মতন জমিয়ে রাখে। গোসলের সময় ধুয়ে ফেলে সব। কেঁদে বের করে দেয় এবং তার এই অভ্যাসের কথা সে আজ পর্যন্ত কাউকে বলেনি। শুধু মেয়েলি ট্যাগ লাগার ভয়েই বলেনি? তার কি তেমন প্রাণের বন্ধু কেউ কখনো ছিল না যার সামনে ম্যাসকুলিনিট মুখোশটা পরতে হয় না?

অমিতের বুকে ভীষণ চাপ লাগতে থাকে। তার হার্টের ব্যামো নেই। সে বুঝতে পারে এক্ষুনি খানিকটা কেঁদে না নিলে তার ভেতরের ঝড়টা থামবে না। অমিত দীর্ঘদেহী এবং স্বাস্থ্যবান। সে জানে তার গায়ে অনেক জোর। সে জানে সে নিজের ভেতরে যে প্রচণ্ড অসহায়ত্ব, ভয়ানক ক্ষোভ আর অক্ষম ক্রোধ অনুভব করছে তা প্রশমনের অল্প কয়টি উপায় আছে, তা হলো বারান্দায়

ঝোলানো পাঞ্চিং ব্যাগটাতে অনেকক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করা কিংবা অনেকক্ষণ দৌড়ে আসা, তা নইলে কাউকে বেধড়ক পেটানো। তৃতীয় কাজটি সে কোনোদিন করতে চায় না বলে এখন তাকে চিৎকার করে কাঁদতে হবে। কিন্তু সে জন্য বাসা পর্যন্ত যাওয়া জরুরি। সে আশা করে কেয়া এখন বাসায় থাকবে না।

কেয়া বাসায় না থাকলে অমিতের এক ধরনের বিরল নিশ্চিন্তের অনুভূতি হয় এখন। যেন ভয় পাবার কিছু নেই। যেন আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে কেউ গিল্টট্রিপিং দেবে না আর এর চেয়ে আনন্দের ঘটনা কিছুই আর ঘটতে পারে না।

অমিত গাড়ি পার্ক করার জায়গা খোঁজে। নিজেকেই বলে, 'অমিত, ইউ ক্যান্ট অ্যাফোর্ড টু হ্যাভ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট নাউ, দ্যাট'স গনা বি আ বিট মেলোড্রামাটিক, নো, নো, নো, নট আ বিট, আ লট'। গাড়ি পার্ক করার মতন কাজ করার সময় অমিত অন্যমনস্ক থাকে না কখনো। আজকেও মাথা ঠান্ডা করেই পার্ক করতে পেরেছে। খুব নির্বিকার থাকার চেষ্টা করে অনেকটা ওভারঅ্যাক্টিং করে, নিজেই নিজের অ্যাক্টিং স্কিলের তারিফ করতে করতে রেস্টুরেন্টের ওয়াশরুমে ঢোকে সে। কিন্তু অভিনয় করার জন্য তো অন্তত একজন অডিয়েন্স দরকার। কার সামনে অভিনয় করছে সে? নিজের সঙ্গেই কি?

ভেতর থেকে লক করে দিয়ে টানা বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়ায় আর সবগুলো কল খুলে দেয়। সকল প্রস্তুতির পর সে টের পায় হাউলের মতন কান্নাটা আসছে না। বহুদিন আর্তনাদ গিলে ফেললে অভ্যাস হয়ে যায়, কাতর চিৎকার হারিয়ে যায়, বের হবার পথ পায়নি তাই অনেক কান্না তার ভেতরেই কোথাও হারিয়ে গেছে—তাকে ক্ষয় করে দিয়ে।

কিন্তু সে কাঁদবে কেন? রিমঝিমের জন্য?

রিমঝিম মরে যাচ্ছে বলে? রিমঝিম কি আসলেই মরে যাচ্ছে?

চার

সুমাইয়া গাড়ি থেকে নেমে আশপাশে তাকিয়ে আত্মীয়দের অনেককেই দেখতে পায়। রিমঝিম আপুর চাচাতো আর ফুপাতো ভাই কয়েকজন। সুমাইয়ার সঙ্গে অনেক বছর পর দেখা তাঁদের। ফারাবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সে। তার বিয়ের অনুষ্ঠান ছোট করে হয়েছিল। একটু দূরের আত্মীয়দের দাওয়াত করা আব্বার বাজেটে কুলায়নি। শুধু নিকটাত্মীয় আর ঢাকা থেকে বড় ফুপুর ফ্যামিলি। পলাশ ভাই রিমঝিম আপু গিয়েছিল একদিনের জন্য। রাতে হোটেলে থেকে পরদিন ফিরেছে। তার বৌভাত ছিল আর একদিন পর ঢাকাতে। বৌভাতেও রিমঝিম আপুই সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে উজ্জ্বল, দেবী দুর্গার মতন ঝলমলে।

তার সবচেয়ে প্রিয় শৈশবস্মৃতি হলো, ধীরাপাড়ার পূজামণ্ডপে দেখা দুর্গাপূজার সিঁদুর খেলার স্মৃতি। সকল কাকিমায়েরা একে অন্যকে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছেন, সবাইকে দেখতে কী সুখী আর সমৃদ্ধ লাগছে। রিমঝিম আপুকেও দেখতে সবসময় সুখী আর সমৃদ্ধ মনে হতো, রানির মতন যেন অনেকটা। দেখে বোঝার উপায় নেই তার কোনো কিছুর অভাব আছে, কোনো মালিন্য, কোনো দুঃখ, কোনো গ্লানি তাকে কখনো স্পর্শ করতে পেরেছে। তার জীবনে যা-ই ঘটে যাক না কেন, সে সব সময় পরিপাটি, সে সব সময় শান্ত, সে সব সময় স্নেহময়ী। কেউ কখনো তাকে উচ্চস্বরে কথা বলতে শোনেনি, কেউ কখনো শোনেনি সে কাউকে ধমকাচ্ছে, সে কখনো বিরক্ত হতো না, হলেও তা প্রকাশ করত না। বড় ফুপা মারা যাবার সময়েও সে রিমঝিম আপুকে শব্দ করে কাঁদতে দেখেনি। সবাই যখন তাকে ডাকাডাকি করছিল বাবাকে শেষ এক নজর দেখে আসবার জন্য, আপু তখন বসার ঘরের সোফা থেকে উঠে গ্যারাজ পর্যন্ত গেল, খাটিয়াতে রাখা ফুপার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর তার ঠোঁট বেঁকে গেল, চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে থাকল, কিন্তু সবই

নিঃশব্দে। আশেপাশের সকলের আহাজারির মধ্যে একমাত্র ফুপার সবচেয়ে আদরের মেয়েটিই যেন ব্যতিক্রম। হয়তো সে শুধু আনন্দ, হাসি আর পজিটিভ ভাইব দেখাতেই আগ্রহী ছিল, দুঃখ, কষ্ট, শোক কিংবা হতাশা নয়। হয়তো এগুলোকে সে খুব ব্যক্তিগত বলে ভাবত। ছিল? ভাবত? আপু কি নেই? থাকবে না? তার বুক কাঁপতে থাকে। সে কেন অতীত কালে ভাবতে শুরু করেছে? নিজের চিন্তাটা তাকে পীড়া দিতে থাকে। হাসিখুশি আর জীবনীশক্তিতে ভরা একজন মানুষকে আজ হাসপাতালে মৃতপ্রায় দেখতে আসতে হলো, যাকে সে সারাজীবন সুন্দর দেখে এসেছে, স্বাস্থ্য আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা দেখে এসেছে...হঠাৎ সুমাইয়ার মনে হয় রিমঝিম আপুকে কখনো ভালো মতো দেখতে সে পায়নি। দেবী দুর্গার সামনে যেমন আরো অনেক মানুষ থাকে, আরো অনেক কিছু থাকে, খুব কাছাকাছি যাওয়া যায় না, রিমঝিম আপুর খুব নিকটে সম্ভবত সে কখনোই যায়নি। ওর চারপাশে একটা ব্যক্তিত্বের বেষ্টনী ছিল। এক বিছানায় ঘুমিয়েও জানা যায় না তার ভেতরে কী চলছে, মন খারাপ কি না, পিরিয়ড চলছে কি না, সামনে পরীক্ষার টেনশন কি না, কিছুই সে বলে না কাউকে।

পলাশ ভাইকে এক ঝলক দেখে সে। অসম্ভব ব্যস্ত, বোঝাই যাচ্ছে। পলাশ ভাই একটা ক্র্যাচ ব্যবহার করছেন। কিন্তু কবে পা ভাঙল তাঁর? সুমাইয়া শোনেনি কিছুই। বড় ফুপুকে দেখতে এই মাত্র কিছুদিন আগেই মগবাজারের বাসায় গিয়েছিল, শাশুড়িই নিয়ে গিয়েছিলেন। তার মা-বাবা ঢাকাতে থাকেন না বলে বিয়াইবাড়ি হিসেবে বড় ফুপুর বাসার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন তিনি। বিয়ের সম্বন্ধ ফুপুরই করা। ঈদ-পরব কিংবা পারিবারিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে নিয়ে যান তাকে। ননদের মেয়ের আকিকা, শ্বশুরের মৃত্যুদিনের মিলাদ মাহফিল, সব কিছুতেই। শাশুড়ির সঙ্গে হলেও দুহাজার স্কয়ার ফিটের খাঁচা থেকে বের হতে ভালোই লাগে তার। কাছেপিঠে কোথাও গেলে রিকশায় যাওয়া যায়, সেটা তার আরো ভালো লাগে। গাড়ি তার পছন্দের বাহন নয়।

হাসপাতালের ভবনে ঢোকার মূল ফটকে, যেখানে কলাপসিবল গেইট একদিকে টানা, আরেক দিকে গুটিয়ে রাখা, সেদিকে এগোতে থাকে সে। ফারাবি পেছন থেকে ডাকে, 'এই, এই, কোথায় যাচ্ছ?'

জনসমক্ষে নিজের স্ত্রীকে 'এই, এই' বলে ডাকে কেউ? সুমু বলতে অস্বস্তি হলে পুরো নাম ধরে তো ডাকতে পারত। সে পেছন ফেরে, ফারাবি এখনো রিমঝিম আপুর কাজিনদের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে। সে শান্তভাবে হেঁটে এগিয়ে যায়। তার বুকের ধুকপুকানি এখনো থামেনি। অজানা আশংকায় ভেতরটা যেন থরথর করছে কিন্তু কাউকে বুঝতে দেওয়া চলবে না—যেন এসএসসি পরীক্ষা দিতে যাবার দিনের মতন। কিছু না বলে ফারাবির সামনে দাঁড়ায় সে।

'তুমি জানো কোন ওয়ার্ডে আছেন, কী সমাচার?'

ফারাবির বিরক্ত কণ্ঠে আর কোঁচকানো ভ্রু দেখে সে মরমে মরে যায়। রিমঝিম আপুর চাচাতো ভাইয়েরা দুই একজন এখানেই আছেন। একজন ভাইয়া, নাম সম্ভবত সোহেল কিংবা শামীম, হাসপাতালের গেইটের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। ওনাদের সামনে কি একটু ভালো করে কথা বলা যেত না? ফারাবি যে এমনই, সবার সঙ্গেই এভাবে কথা বলে, এটা কি ওনারা বুঝবেন? সুমাইয়ার চোখে পানি চলে আসে।

শোয়েব একবার তাকে চোখের পানি শুকানোর একটা পদ্ধতি শিখিয়েছিল। বলেছিল, 'কোনো একটা দিকে চোখের পাতি না ফালায়া তাকায় থাকবি, অনেকক্ষণ পাতি না ফালাইলে এমনেই চোখ শুকাইয়া যায়।' সে চেষ্টা করে দেখেছে, এই পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকর হয় না। অন্তত তার জন্য তো হয়নি কখনো। শোয়েব খুব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলত। একবার তার সামনেই কাকে যেন বলছিল, 'পাবলিক প্লেসে হাগা ধরলে নাভিতে ধইরা উপরের দিকে টানবি, বেগ কইমা যাইব। তাইলে হাগার জায়গা খুঁইজা বাইর করার টাইম পর্যন্ত হাঁটবার পারবি। আর যুদি বাথরুমের সামনে সিরিয়াল থাকে, খাড়ায় থাকবার পারবি।

মানিব্যাক গ্যারান্টি...' বলেই তার সে কি ঠাট্টা হাসি। সুমাইয়া মনে করার চেষ্টা করে, ফারাবিকে সে কখনো অট্টহাসি হাসতে দেখেছে কি না। ঘর ফাটিয়ে হাসার মতন কোনো ঘটনা কি তাদের দুই বছরের দাম্পত্য জীবনে কখনোই ঘটেনি?

শোয়েবের উচ্ছ্বসিত হাসির আওয়াজ তার কানে বাজতে থাকে। এমনকি ওর ছোট ছোট করে কাটা চুল, হাতের মোটা ব্রেসলেট, হাঁটুর কাছে ছেঁড়া ডেনিমের ভুসভুসে রং, ওর পোলো-শার্টের বোতামের কাছে দেখা যাওয়া বুকের লোম...সবকিছুই চোখে ভাসতে থাকে। ওর দেওয়া পদ্ধতি আরেকবার ভুল প্রমাণিত হয়। গেইটের বাইরে সোহেল কিংবা শামীম ভাইয়ের সিগারেট খাওয়ার দিকে চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে থেকে কোনো ফায়দা হয় না। পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে।

'আরে, আরে কাইন্দো না, আইসিইউতে আছে, ট্রিটমেন্ট চলতেছে।'

কথাটা পাশ থেকে কেউ একজন বলছেন, রিমঝিম আপুর কোনো চাচাতো ভাই, ঝাপসা চোখে সে বুঝতে পারে না এই ভাই কোনজন। কিন্তু তার বলার ভঙ্গি শুনে মনে হচ্ছে, নিজের কথার উপর তার নিজেরই তেমন একটা আস্থা নেই।

হার্ট অ্যাটাক হলে তো সিসিইউতে রাখতে হয়, আপুকে আইসিইউতে রেখেছে কেন? সুমাইয়ার চোখের সামনে সব অস্পষ্ট হয়ে যায়। মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যেতে থাকে। তার মনে পড়ে রিমিঝিম আপুর গায়ে-হলুদের দিনের কথা। সবাই নিজের সাজগোজ নিয়ে খুব ব্যস্ত, কেউ তাকে শাড়ি পরিয়ে দিচ্ছে না। রিমিঝিম আপু ছাদে বানানো স্টেজে বসেই দেখল সে ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতছানি দিয়ে ডেকে তাকে বলল, 'তুমি শাড়ি পরবা না?'

পাঁচ

বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে বের হয়ে এসে অমিত একটা আমেরিকানো অর্ডার করে। ক্যাফের একদিকে একটা স্মোকিং জোন দেখা যাচ্ছে কিন্তু তার কাছে সিগারেট নেই। কেয়ার প্রবল আপত্তির মুখে সে ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে বিয়ের পরের বছরই। অকেশনালি সোশ্যাল স্মোকিং মাঝেমধ্যে করে। সেটাও কেয়ার আড়ালে, অবশ্যই। পলাশের সঙ্গেও ধূমপান করেছে অনেক সময়। বেড়াতে টেড়াতে গেলে, যেসব ট্যুরে শ্বশুর-শাশুড়ি ছিলেন না, তেমন সময়গুলোতে। তারা প্রথম যখন দলবেঁধে সেন্টমার্টিন গেলো, পলাশ-রিমঝিমের বিয়ের কিছুদিন পর। অনিন্দিতা খুব ছোট, কেয়া তাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, পলাশদের কোনো ছেলেপুলে তখনো হয়নি। সেই দলবেঁধে সিনেমা দেখার, লুডু খেলার, বেড়াতে যাওয়ার আনন্দগুলো ফুরিয়ে যায়নি, তখনকার কথা। পলাশ কয়েক প্যাকেট বেনসন অ্যান্ড হেজেস নিয়ে গেছে। তিনদিন থাকবে প্রবাল দ্বীপে, সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না, গেলেও আগুন দাম...সেই ভেবেই নিয়েছে। কেয়ার সামনে পলাশের সিগারেট খাবার প্রশ্নই আসে না। সে রিসোর্ট থেকে বের হয়ে বিচে অনেকদূর হেঁটে এসে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করেছিল।

'বউয়ের সামনে সিগারেট টানবি? বউ বকবে না?' ওর প্যাকেট থেকে সিগারেট নিতে নিতে বলেছিল অমিত। পলাশ সমুদ্রের উথালপাথাল বাতাস থেকে আড়াল করে নিজের সিগারেট ধরিয়ে সেটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখেই তার সিগারেট ধরিয়ে দিল। তারপর ডান হাতে লাইটার পকেটে রেখে বাম হাতে সিগারেট ধরে একটান ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল,

'আরে নাহ, রিমঝিমের নাকি ছেলেদের সিগারেট খেতে দেখলে ভালো লাগে।'

সে রিমঝিমের দিকে চেয়ে ভ্রু নাচায়, 'তাই নাকি?' ভঙ্গিতে। রিমঝিম ফিক করে হেসে ফেলে, সামান্য লজ্জা পায়।